?????? ???????????? ????

?????? ???????????? ????

বাংলাদেশের নবীন প্রজন্মের শক্তিশালী গদ্যকার মুরাদুল ইসলামের জন্মস্থান সিলেটের জগন্নাথপুরে। তাঁর একটি গল্পগ্রন্থ ইতমধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে। আজ প্রকাশিত হল তাঁর পরীক্ষামূলক গল্পমালা।

মুরাদুল ইসলাম

?????? ????? ????????

প্রেম পিরিতি নিয়া আপনারা যেসব কথাবার্তা বলেন, অধিকাংশই ইডিয়টিক, ফালতু সব ভাবাবেগে আক্রান্ত, এবং একথা আপনারাও জানেন, আমি এবং অন্যসব জীবজন্তুরা আমরা সবাই জানি যে ঐসব রোমান্টিক কথাবার্তার পিছনে কোন যুক্তি নাই, যেমন ভূতের গল্পের যুক্তি নাই, সাত আসমানের যুক্তি নাই, এবং আরো অনেক কিছুরই নাই;

কিন্তু তাও চলে এসব, মানুষরে বুজরুকি দিয়া চালান চালাকেরা, এবং নির্জলা যৌন আকর্ষণরে প্রেম পিরিতি ও স্বর্গীয় জিনিস ভাইবা আনন্দ পান, নিজেদের বিশেষ মনে করে অন্য জীব জানোয়ারের চাইতে, আর স্বর্গ, ভ্রাত ও ভগিনীগণ, জিনিসটাও তো ইল্লজিক্যাল; আর এইটা কেমন কথা যে আপনে একটা জীব, একটা পশু এবং তা হইতে অস্বীকার করবেন, অন্যসব প্রাণীরাও কী তা করে, তারা যা না তাই হইতে গিয়া সারা লাইফ চেষ্টা করে, এবং তারা যা তা হইতে করে অস্বীকার?

যাহাই হোক, যাহাই হোক, আমার কাছে ইন্টারেস্টিং একটা ঘটনা আছে, একজন দার্শনিকের মইরা যাবার, ঘটনাটি বিচিত্র ও যুক্তিহীন, তবে এইটা নিয়া আমি ভাবি মাঝে মাঝে, যে কার্ট গডেল কেন এইভাবে মরলেন, না খাইয়া খাইয়া, তার ওজন দাঁড়াইছিল উনত্রিশ কেজিতে, কী এক পক্ষীজাতীয় মানুষ হইয়া মরলেন তিনি, আমি শুনেছি মগধের লোকেরা আগে আগে এতদঞ্চলের মানুষদের বলতো পক্ষীজাতীয়, আচ্ছা কোনভাবে কি গডেল আমাদের আত্মীয় লাগেন নাকী?

গডেলের মরার বিস্ময়কর কারণ হইল তার ভয়, তিনি মনে করতেন তার বউ ছাড়া আর কেউ খাওয়াইলে কিছু তার মধ্যে থাকবে বিষ, সেই বিষে আক্রান্ত হইয়া মারা যাবেন তিনি, এই ভয়েই তিনি বউয়ের হাতে ছাড়া খাইতেন না কিছু, আর একদিন তার বউ অসুস্থ হইয়া ছয়মাসের জন্য গেলেন হাসপাতালে, আর, আর, আমাদের গডেল খানাপিনা ছাইড়া দিলেন, না খাইয়া না খাইয়া

তিনি মইরাই গেলেন;

এই যে গডেলের ভয়, অন্য কেউ খাওয়াইলে দিবে বিষ, আমার মনে হয় এইটারেই বলে পিরিতি বা প্রেম; অথবা প্রেমের ভিতরে, গভীরে গভীরে, খুব গভীরে এই যুক্তিই থাকে যে প্রেম যার সাথে হইতেছে হইতেছে, তার কাছে আমি নিরাপদ, কোনভাবে এই ফিলিংটা আসে আমাদের ভেতরে, কিন্তু অনুভূতি বড়ই দুর্বোধ্য, বুঝা নাহি যায়; আর আমরা তারে বুঝতে না পাইরা কতো কিছু যে বানাই, কতো ভুল বুঝি!

[illegible]

লোককথার প্রাচীন সেই গল্পটি আপনি অতি অবশ্যই শুনে থাকবেন, আমার স্পষ্ট মনে নাই, ফ্রয়েড তার মোজেস ও মনোথিজমে বলছিলেন যে প্রায় সমাজেই এই গল্পটি প্রচলিত হয়েছে, এমন একজন অতি ক্ষমতাধর মহাপুরুষ জন্মেছেন সেইসব এলাকায়, যিনি যখন শিশু ছিলেন তখন কোন এক কারণে তার মা বাবা তাকে ফেলে দিয়ে এসেছিলেন জঙ্গলে, আর সেই শ্বাপদে পূর্ণ হিংস্র জঙ্গলে শিশুটি কেউ কেউ করে কেঁদে উঠেছিল কুত্তার বাচ্চার মতো, আর ঝড় ঝঞ্ঝা বয়ে যায় জঙ্গলে, আর কতো সব পোকামাকড় কিলবিল করে, বৃষ্টির ফোঁটা স্যাতস্যাতে মাটিতে পড়ার পরে পরেই মাটির গভীরে থাকা অন্ধকারের জীবগুলি বাইরে বেরিয়ে আসে, তাদের ঘ্রাণেন্দ্রিয়ে লাগে সদ্য জন্ম নেয়া এক মানবশিশুর ঘ্রাণ, আর দূরে দূরে নেকড়েদলের সর্দারের জিভে লালা ঝরে;

এগিয়ে আসে বিষাদ, এগিয়ে আসে অন্ধকার, শিশুটির কান্নায় আকাশ ভারী হয় না, জঙ্গলেই তা মিলায়ে যায় হিংস্র সব জানোয়ারদলের উল্লাসের ধ্বনির নিচে, আর তখন এই গুরুদয়াল সাপ কোথা থেকে যেন এগিয়ে আসে, মনসা দেবীকে স্মরণ করে শিশুটির দুঃখিনী মাতা পূজা দিয়েছিলেন কি না জানি নে, কিন্তু সর্প এগিয়ে আসেন, তিনি তাঁর বিশালকায় ফণা বিস্তার করেন, গাছের পাতা চুঁইয়ে পড়া বৃষ্টিজলের হাত থেকে শিশুটিকে বাঁচান, তিনি তারে ছায়া দেন, তিনি তারে মায়া দেন, আর সর্পরাজের এহেন আচরণে বিস্মিত হিংস্র পশুকূল দূরে দূরে রয়, তারা কাছে ঘেঁষতে ভয় পায়;

এইভাবে বেড়ে উঠেন প্রাচীন শিশুটি, মহামানব তিনি, আমরা তার কথা ভাবি আর কষ্ট পাই, সেই দুঃখ সময়ের কথা ভেবে, সেই প্রতিকূল পরিবেশে কীভাবে বেড়ে উঠছে শিশুটি, চারিদিকে বিভীষিকাময় রাত্রি ও রাত্রির মাঝে?

হায়! গল্পটির কী নিদারুণ ভুল ব্যাখ্যাই না আমাদের শেখানো হয়েছে, অথবা বিধাতা হয়ত ঠিকই আমাদের বুঝিয়েছিলেন কিন্তু আমাদের দুর্বল বুঝশক্তি তা ধরতে পারে নাই, কীরকম ভুল ভেবেই না আমরা বসে আছি, ও সেই শিশুটিকে দূরের কেউ একজন ভেবে তার জন্য আমাদের মায়া হয়, আমরা সমব্যথী হই, কিন্তু হায়! গল্পটাতে তো আমাদের কথাই বলা হয়েছে, আমাদেরই জীবন ও বেড়ে উঠা, চারিদিকে রাত্রি ও রাত্রির মাঝে, বিপুল বিষাদ ও দুর্দশার মাঝে আমরা, আমরা সেই সত্য বুঝবো কবে?

[illegible]

আমার বাপরে আপনারা হয়ত চিনে থাকবেন, মাঝারি আকৃতির লোক, বয়স পঞ্চাশের অধিক, মাথায় লম্বা ধরনের চুল এবং চোখে চশমা পরিধান করেন, সুপারি খেতে খেতে তিনি পথ চলেন, আপনারা তাকে চিনে থাকবেন, তিনি পাঞ্জাবি ও লুঙ্গি পরেন প্রায়ই;

জন্ম দিয়েছেন তিন বিয়েতে তেইশটি সন্তান, আমি কেবল আমার আপন ভাইবোন অর্থাৎ ৬ জনের খবর জানি, বাকীদের দেখি নি, তবে শুনেছি তারা আছে, দেখি নি বলে যে তারা নেই এমন তো আর বলা যায় না, চাঁদ আমরা দেখছি বলেই কি আছে নাকি, আমরা না দেখতে পারলে কি থাকতো না, অথবা যদি রাশি রাশি চন্দ্রমহাশয় জমায়েত থাকেন দূর দূর আকাশে, যাদের আমরা

দেখি না, দেখি না বলে কি তারা নেই? অবশ্যই না; তাঁরা আছেন, অস্তিত্বের জন্য অন্যের দেখার দরকার নাই বরং অনস্তিত্বের জন্য অন্যরে দরকার হয়, যেমন মৃত্যু, মৃত্যু এমন জিনিস যা সম্পর্কে আমাদের অভিজ্ঞতা হচ্ছে অন্যের অভিজ্ঞতা থেকে প্রাপ্ত, নিজেদের মৃত্যু তো আর আমরা এক্সপেরিয়েন্স করতে পারি না, অন্তত ধরাধামে জীবিত থাকতে থাকতে, আর মরণের পরে কেউ যেহেতু আসেন না ফিরে, কল্পকাহিনী ব্যতিরেকে-

তা যা বলছিলাম, আমার পিতৃদেব, যিনি তেইশ সন্তানের জন্ম দিয়ে নিজের জিন বেশ ভালোভাবেই ছড়ায়ে দিয়েছেন, তিনি সাম্প্রতিক কালে ডেভিড বেনাটার পড়ে পড়ে দার্শনিক হয়ে গেছেন, আর পথে ঘাটে লেকচার দিয়ে বেড়াচ্ছেন পুনরুৎপাদনের অনৈতিকতা বিষয়ে;

বড় ঝামেলা হয়েছে আমার জন্য, না আমি পুনরোৎপাদন করতে চাই এজন্য না, বরং পিতার এহেন আচরণে আমাকে নানাজন নানাভাবে প্রশ্ন টশ্ন করে বিব্রত করতে থাকেন, তারা হাসাহাসি করেন; শেষে একদিন রাতে বিরক্ত হয়ে আমি বাপকে বললাম, বাপ এসব কী করেন আপনে? দার্শনিক তো আপনে এমনেও হইতে পারেন। বেনাটার চর্চা করতে হয় নাকি?

বাপ তখন ঘরে বসে পান খান আর অ্যান্টি-নাটালিজম বিষয়ে প্রবন্ধ পড়েন, আমার কথা শুনে তিনি চশমার উপর দিয়ে চোখে রেখে আমার দিকে তাকান ও বলেন, ক্যামনে কী?

এইখানে বলে রাখা ভালো আমি একটা বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শন পড়াই বলে বাপ আমারে অল্প গুরুত্ব দিতেন এইসব ব্যাপারে;

আমি বাপরে বললাম, পিতা, আপনে জীবন ও জগতরে দেখেন, দর্শনের মূল হইল দেখা, দেখেন যে আমাদের বুদ্ধ মহাশয় রাত্রিবেলা ঘর হইতে বাইর হলেন দুঃখ জরা শোক থেকে মুক্তির উপায় খুঁজতে, মানে জীবনের জন্যই তিনি একটা উপায় খুঁজতে গেছিলেন, তাই নয় কি?

বাপ পান চিবাতে চিবাতে বললেন, ঠিক ঠিক। কিন্তু সেইটা আমি কেমনে করব, পুত্রধন?

বাপের এই প্রশ্নে আমি বিব্রত হলাম, কারণ আমি কী বলবো ঠিক করতে পারছিলাম না, তখন জানলা দিয়া ঠা ঠা চাঁদের আলো আসছে আমাদের ঘরে, সেই চন্দ্রকিরণ দেখে আমি এক উত্তর পেলাম, বাপরে বললাম, পিতা, আপনে ছাদে যান, গিয়া চাঁদ দেখেন, অইটা দেখতে দেখতে আপনার মধ্যে ফীল আসবে, ভুইলা যাইয়েন না নিমাই চন্দ্রদীপ্ত রাতেই বের হইছিলেন, ফলে চাঁদের সাথে একটা ইয়ে, মানে যোগাযোগ আছে দর্শনের;

আমার কথায় উৎফুল্ল হইলেন পিতা, তার চোখ জ্বলজ্বল করে উঠল যেন, তিনি প্রবন্ধ পাঠ বাদ দিয়ে গেলেন ছাদে, দেখতে লাগলেন চাঁদ, তিন ঘণ্টা পরে আমি গিয়া একবার দেখছিলাম তিনি মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে আছেন চাঁদের দিকে, ঠায় বসে;

পরদিন বিশ্ববিদ্যালয়ে যাবার সময় আমি শুনতে পাই বাপ আমার আর ছাদ থেকে নামেন নি সে রাতে, পুরা রাত তিনি চাঁদ দেখছেন এবং একসময় ছাদেই ঘুমিয়ে পড়েছেন;

তাঁর রুমে আমি গেলাম দেখা করতে, ঢুলুঢুলু লাল চোখ তাঁর, আমি কিছু জিজ্ঞেস করলাম, কিন্তু ভদ্রলোক কোন জবাব দিলেন না, গম্ভীর হয়ে রইলেন, আমার তখন মনে হলো তিনি বোধিপ্রাপ্ত হইলেন কি?

যাইহোক, সন্ধ্যায় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফেরার পরে আরেক ঘটনা শুরু, শুনলাম বাপ বের হয়ে গেছেন ঘর থেকে দুপুরের দিকে, আর ফিরেন নাই, পরিচিত একজন সন্ধ্যার চা খাইতে আসলেন বাসায়, আর তিনি চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন কথাটা, আমার পিতা

মহাশয় এইবার রাস্তায় ঘুরে ঘুরে লোকদের বলছেন যে কাল রাতে তিনি নীল আর্মস্ট্রংকে চাঁদে দেখেছেন, চাঁদ থেকে টেলিপ্যাথি বা অন্য কোনভাবে আর্মস্ট্রং তার সাথে যোগাযোগ করে জানিয়েছেন মহাগোপন সেই কথাটি, চাঁদে যাবার পরে চাঁদের জীবেরা তাঁকে ওখানে আটকে রাখে, আর পৃথিবীতে যে এসেছে আর্মস্ট্রংয়ের বেশে সে আসলে অন্য কেউ, আর্মস্ট্রং ফরিয়াদ জানিয়েছেন পৃথিবীর লোকেরা যেন তাকে বাঁচায়, ও মুক্ত করে আনে চাঁদের জীবদের হাত থেকে, চাঁদের দেশ থেকে;

বাপ আমার এই নিয়ে প্রচারণা চালাচ্ছেন, তিনি গণস্বাক্ষর সংগ্রহ করবেন, আন্দোলন করবেন, নীল আর্মস্ট্রংকে মুক্ত করে আনবেন, এই এখন তার জীবন বাসনা; আর এদিকে আগের চাইতে বেশী বেশী লোক এখন তার প্রতি ইন্টারেস্টেড, ফলে সেইসব যোগাযোগের ভার আমাকে সইতে হচ্ছে;

???? ????????

গল্পটি আমার নিজের গল্প এবং একইসাথে আমাদের নাতিদীর্ঘ শহরের গল্প, ফলে গল্পটি একটু বিচ্ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হতে পারে, ব্যাপারটা আগে জানিয়ে রেখেই শুরু করছি;

পাঠকবৃন্দ, আপনারা গল্প বিষয়ে ভয় পাবেন না, কারণ এই গল্পে থ্রিল আছে, ঘটনাটির মূল শুরু হয় এক চৈত্র মাসের রাতে, আমাদের শহরে সুন্দরী কিছু মেয়ে একের পর এক খুন হতে থাকে ধুমধাম, নৃশংস সব খুন, যেন কাহিনিটি হচ্ছে দারিও আরজেন্টোর কোন জাল্লোতে; মারাত্মক ঘটনা, সুন্দরীদের মৃত্যু শহরে আলোড়ন তুললো, ভয়ের সৃষ্টি করলো, মানুষের মানবিক অনুভূতিতে শুরু হলো উথাল পাতাল ঝড়;

শহরের গোয়েন্দা, পুলিশসহ প্রাইভেট ডিটেক্টিভ কেউ কোন কিনারা করতে পারে না হচ্ছেটা কী, একের পর এক খুন হতে থাকলো নিয়মিত বিরতিতে;

আমাদের শহরে একজন চিত্রশিল্পী ও কবি ছিলেন, একই সাথে তিনি ছবি আঁকতেন ও কবিতা লিখতেন, মারাত্মক আর্ট বুঝা লোক কিন্তু তাঁর সমস্যা হলো তিনি মধ্যরাত্রে তাঁর চিতা বাঘটিকে নিয়ে শহরের রাস্তায় বের হতেন হাওয়া খেতে এবং কয়েক ঘণ্টা হেঁটে ফিরে আসতেন বাসায়, এমনই হয়ে আসছিলো অনেক বছরকাল ধরে, ভদ্রলোক নিরীহ, তাঁর কালো চিতাটাও সেরূপ এবং মধ্যরাত্রিতে আর কয়জন লোক বাইরে থাকে আমাদের শহরে, তাই এটি বিচিত্র খবর হলেও, তেমন বড় সমস্যাজনক কিছু ছিল না, কিন্তু, কিন্তু সমস্যাজনক হয়ে দাঁড়াল যখন পুলিশ ও গোয়েন্দারা সুন্দরীদের খুনের কোন কিনারা করতে পারল না তখন;

তারা বলতে লাগলো শিল্পী মহাশয় তার বাঘ দিয়ে এসব কার্য করে বেড়ান, তাই তাকে ইনস্ট্যান্ট মৃত্যুদণ্ড দিতে হবে, কোর্ট ফোর্টের তোয়াক্কা করে লাভ নেই, আমাদের মেয়র দ্রুত সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন, বিরাট এক অগ্নিকুণ্ড করে শিল্পীকে সেথায় ফেলা হবে, এভাবেই হবে তার মৃত্যুদণ্ড, আর আরেকটা ব্যাপারও আছে, তিনি নির্দোষ হলে এবং তিনি বিশেষ কেউ হলে, একটা সম্ভাবনা আছে তাঁর গায়ে আগুন না লাগার, যেমন একজন নবীর বেলায় হয়েছিল, আগুন হয়ে গিয়েছিল ফুল বাগিচা;

আমি যখন শুনতে পেলাম শিল্পীকে টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে বিরাট অগ্নিকুণ্ডের দিকে তখন আমি বাংলা মদ খেয়ে হাফ মাতাল এবং ঘরে বসে জিরার্দ পড়ছি; এখানে আমার বাংলা মদ খাওয়া শেখার বা কুত্তাদের ঘৃণা করা শুরু করার ইতিহাসটাও বলে নেই, প্রাসঙ্গিক বিষয়, আমি আসলে বাংলা খেতাম না, টুকটাক যা খেতাম তা অন্য কিছু কিন্তু একদিন মধ্যরাতে আমি শুয়েছিলাম রাস্তায় আর দেখতে পাই দামী গাড়ি থেকে নেমে একটা লোক ড্রেইনের ধারে দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করছে, আমি তখন বেশ অবাক হলাম, এবং এরপর দেখলাম একটি লোক ছুরি নিয়ে এগিয়ে আসছে তার পেছন দিকে, ভদ্রলোক তখন আপনমনে প্রস্রাব করছেন, অগত্যা আমাকে দ্রুত উঠতে হলো, ছুরিধারীকে ধাক্কা দিয়ে আমি ভদ্রলোককে বাঁচাই, সেই থেকে আমাদের পরিচয় হয়, তিনি

আমাকে জানান যে তিনি একজন শিল্পপতি লোক, নাম জয়নুল আবেদিন সরকার, এবং রাস্তার ধারে ড্রেইনে প্রস্রাব করা তার হবি, তাই তিনি এভাবে মধ্যরাতে আসেন ও ড্রেইনে প্রস্রাব করে যান;

লোকটাকে আমার ভালো লাগল, তিনি সেদিন আমাকে এক চামারবাড়িতে নিয়ে যান, চামারবাড়িতে বাংলা মদ উৎপন্ন হয়, ওরা বানায় ও বেচে, ভালো বিজনেস; এইটা আমি জানি কারণ আমাদের গ্রামে চামারেরা ছিল কয়েকঘর, আমার নানা মহাশয় এদের থাকতে দিয়েছিলেন কারণ তার চৌধুরী হবার খায়েশ জন্মেছিল, চৌধুরী হতে গেলে কয়েকঘর রায়ত লাগে তখন ছিল রীতি, কিন্তু নানা সাহেবের চেষ্টা কাজে দেয় নি, তিনি চৌধুরী হতে পারেন নাই, যাইহোক, ভদ্রলোক নিজ পয়সায় আমাকে খাওয়ালেন, এরপর আমি যখন টাল তখন আমাকে বললেন, 'আপনি কি একা একা যাইতে পারবেন? আমি আইজ রাইতে এখানে থাকবো';

আমি বুঝলাম যে তিনি চামান্নির সাথে রাত কাটাবেন, এই কাজে আমার বাগড়া দিতে ইচ্ছে হলো না, তাই টলতে টলতে একাই চললাম আমার গন্তব্যে, কিন্তু পথিমধ্যে এক ডাস্টবিনে হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাই, পরদিন সকালে ময়লা নিতে আসা লোকটির চেঁচামেচিতে ঘুম ভাঙে, আর আমি দেখতে পাই যে এক থাল কুত্তার বিষ্ঠার মধ্যে পড়েছিল আমার মুখমণ্ডল, বিষ্ঠা বেশ শক্ত হয়ে লেগে আছে মুখের মানচিত্রে আর ভনভন করছে গু খেকো মাছির দল, সেই থেকে কুত্তাদের আমি দেখতে পারি না;

যাইহোক, আবার আগের জায়গায় ফিরি, শিল্পীকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে অগ্নিকুণ্ডে, আর আমি হাফ মাতাল হয়ে জিরার্দ পড়ছি, এমন সময় হল সেই আশ্চর্য ঘটনা, আমি দেখলাম ঝাঁঝালো আলো, আর কে একজন এলেন আমার সামনে, তাঁর সারা শরীর উজ্জ্বল শুভ্র পোষাকে আচ্ছাদিত, তাঁর মুখমণ্ডল বর্ণনক্ষমতার বাইরে সুন্দর, আমি বাকরুদ্ধ হয়ে ছিলাম তাকে দেখে, কিন্তু তিনি হেসে বললেন, 'বৎস, ডোন্ট ওয়ারি, বইটা আগুনে ফালাইয়া দিয়া আসো। মেলা কাজ সামনে।'

আমি আর দেরী করি নাই, শিল্পীরে ফেলা হয়েছিল আগুনে, দাউ দাউ আগুন লেলিহান তার সমস্ত শরীর মেলে খাইখাই করছে কেবল, আমি সে আগুনে রেনে জিরার্দকে ফেলে দিলাম;

?????????? ????? ????????

ন্যাটিভিটির পিকচার দেখতে দেখতেই সৈয়দ মান্নানের মনে প্রথমবারের মত কনফিউশন তৈরি হয়, তার মনে হতে থাকে কাহিনি একটা আছে, তার স্পষ্ট মনে হতে থাকে হরগোবিন্দ ইস্কুলে ক্লাস ফাইভে ভর্তির সময়ে যখন হেডমাস্টার তাঁর জন্মতারিখ জিজ্ঞাসা করেছিলেন তখন বাপ সৈয়দ বারি খানের মধ্যেও বেশ কনফিউশন ছিল, এবং একসময়ে সেই অস্বস্তিকর অবস্থা থেকে মুক্তির জন্যই হয়ত তার বাপ একটি তারিখের কথা বলে দেন; সেই জন্ম তারিখ থেকে হিসাব করলে আজ সৈয়দ মান্নানের বয়স ষাট বছর বিরাশি দিন তেরো ঘন্টা আট মিনিট বারো সেকেন্ড;

সৈয়দ মান্নানের এও মনে পড়ে তার মা গেদনি বিবিকে কয়েকবার তিনি প্রায় কারণ ছাড়াই জিজ্ঞেস করেছিলেন তার জন্ম বিষয়ে, তখন তার মা জানান দেন ঐ যেইবার বিরাট বইন্যা হইল, ঐ যেইবার বিরাট ঝড় হইল, কিন্তু এইভাবে কি আর দিন তারিখ খুঁজে পাওয়া যায়, হঠাৎ হঠাৎ অনেকদিন পর পর ঝড় টর বন্যা ইত্যাদি হলে নাহয় কথা ছিল, খোঁজার একটা চেষ্টা করা যেত, কিন্তু বাংলাদেশ এমন একটা টাইপের জিওগ্রাফিক্যাল পজিশনে আছে যে বন্যা খরা ঝড় বৃষ্টির অগণন আগমন এত কমন যে আসলে তাদের প্রত্যেককে আলাদা করে চেনার কোন উপায়ই নাই;

কিন্তু বিষয়টা তো জানতে হবে, সৈয়দ মান্নান, অবসরপ্রাপ্ত বড় সরকারী সচিব চ্যালেঞ্জ অনুভব করলেন, তিনি সেই রাতেই নিশিপোষাকে বেরিয়ে গেলেন শহরে, মাছ কিংবা হারুণ আল রশিদের মতো ঘুরে বেড়ালেন রাস্তায় রাস্তায়, এখানে ওখানে উঁকি দিলেন তিনি, দূরে দূরে বিষণ্ণ ঘোড়ার চিঁহি, স্নায়ুর রণন-ঝনন, তার হাঁটতে হাঁটতে নিজেকে মনে হচ্ছিল এক চাক ভাঙা মৌমাছি,

উন্মথিত চৈত্ররাত্রে হেঁটে চলেছেন, আর নিদারুন নিস্তব্ধতায় দৃপ্ত ঘোটকীর মত চলে যাচ্ছে সময়, সময়!

এভাবেই হাঁটতে হাঁটতে, হাঁটতে হাঁটতে, আমাদের সৈয়দ মান্নান চলে গেলেন তাঁর জন্মগ্রামে, তখন সকাল হয়ে এসেছে, দূর থেকে ভেসে আসছিল পাশবিক ট্রেনগাড়ির শব্দ, আর তিনি দেখতে পেলেন এক কিশোরীকে যার ভেতরে বাস করছিলো এক যুবতী;

মেয়েটি হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল ভ্রমণশীল সৈয়দ মান্নানকে, এক বাঁধাকপির ক্ষেতে, জীবনোচ্ছল আলো তখন ফুটে উঠেছে চারিধারে; আর ধীরে ধীরে সৈয়দ মান্নানের মনে পড়তে লাগলো অনেক কিছু, একদিন এই গ্রামের সব নিশ্চিত ধুলোবালির সাথে তিনি খেলেছেন আর ঘুরে বেড়িয়েছেন তার নানা প্রান্তে, তাদের সাথে একটি ছেলে ছিল মোকাররম, এডিসন মুরগির ডিম নিয়ে তা দিয়েছিলেন বাচ্চা ফোটে কি না দেখার জন্য, এই গল্প শুনেছিল সে তার মায়ের কাছ থেকে, মাতা সন্তানকে জ্ঞানের প্রতি আগ্রহী করে তুলতেই গল্পটি বলেছিলেন আর মোকাররম সত্যি সত্যি আগ্রহী হয়ে উঠেছিল, এবং একদিন তাকে আর পাওয়া যায় না, অনেক অনেক খোঁজাখুঁজি হলো চারিধারে, কিন্তু পাওয়া গেল না; অতঃপর তাঁর জননীর মনে হলো এডিসনের কথা, দয়ার্দ্র হৃদয়ের জননী তখন নির্দেশ দিলেন খড় জমিয়ে রাখা হয় যেই ঘরে সেখানে খোঁজ নিতে, সেখানে লোকেরা গেল ও দেখতে পেল একটি অচেনা মুরগি কয়েকটি ডিম নিয়ে বসে তা দিচ্ছে, অথবা মোকাররম ডিমে তা দিতে দিতে, জ্ঞানের প্রতি তার অতি আকাঙ্ক্ষা বাড়তে বাড়তে সে মুরগিতেই পরিণত হয়েছে, আর এর কিছুদিন পরে সেই মুরগিকে রেপ করেছিলো পশ্চিম ঘরের নানার ষড়ালি মোরগটি, সৈয়দ মান্নানের চোখের সামনেই, এবং পরে মান্নান শুনেছিলেন ঐ মুরগি পরবর্তীতে যে ডিম পারে সেই ডিম ফুটে একটি বানরের মতো জন্তু বের হয়, যে নাকি কিছুটা বড় হয়ে পাবলো নেরুদার মতো কবিতা লিখত এমনও শুনেছিলেন তিনি;

এইসব মনে পড়ে গেল সৈয়দ মান্নানের, মনে পড়ে গেল যে এলিয়েন একবার নেমে এসেছিল তাদের গ্রামে, দূরের শ্মশানে, নারীর নিতম্বাকারের এক স্পেসশিপে করে ওরা এসেছিল, সৈয়দ মান্নান অবশ্য দেখেন নি, শুনেছেন, এবং তিনি শুনেছিলেন বর্ণনাতীত এক খলবল শব্দের কোলাহল;

সৈয়দ মান্নান মেয়েটির হাত ধরে ধরে, অনেকের ঘরে ঘরে গেলেন, যাঁরা বৃদ্ধ আছেন, বয়স্ক আছেন, তাঁদের কাছে তিনি জানতে চাইলেন তাঁর জন্ম বৃত্তান্ত, কিন্তু কেউই সঠিক দিন তারিখ কিছুই বলতে পারলো না, তাদের এই না বলতে পারা যেন একটু একটু করে সৈয়দ মান্নানকে পরিচয়হীন করে তোলতে লাগলো, বারুদের গন্ধ পেলেন তিনি নাকে, কী একটা অবস্থা তখন, কারফিউ শাসিত শহর যেমন, একটা মানুষ ভুল জন্ম তারিখ নিয়ে, বা সঠিক জন্ম বৃত্তান্ত না জেনে, কীভাবে, কীভাবে বাস্তবের দরজা খুলে যাবে স্বপ্নের বারান্দায়, সৈয়দ মান্নান বুঝতে পারেন না;